

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের প্রেক্ষিতে বাঙালির রসনাবিলাস

Dr. Prosenjit Mahapatra*

সংক্ষিপ্তসার (Abstract): মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের প্রধান ধারাগুলিতে সেই সময়ের বাঙালি মানসের রসনাবিলাসের পরিচয়। মধ্যযুগের প্রধান সাহিত্যধারা মঙ্গলকাব্যে রসনাবিলাসের অনুসন্ধান। বিজয়গুপ্ত এবং নারায়ণদেবের কাব্যে বাঙালি রসনার পরিচয়। মৎস্যপ্রিয় বাঙালির মাছের প্রিয় সব পদের বর্ণনা। পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের পৃথক রন্ধনশৈলি। ষোড়শ শতকে মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে বাঙালি খাদ্যাভ্যাসের পরিচয়। ডালের জনপ্রিয়তা এই সময় থেকে। কৃত্তিবাসের কাব্যে বাঙালিয়ানার অন্যতম দিক রসনাপ্রিয়তার বিবরণ। কিভাবে কৃষ্ণদাস কবিরাজের কাব্যে চৈতন্যজীবনী বর্ণনা করতে গিয়ে এসে পড়ে সমকালীন নানা শাক-সজ্জি ও তা দিয়ে নির্মিত নানা মনলোভা পদ। নিরামিষ রান্নার বহু প্রণালী কিভাবে মধ্যযুগের কবিদের কাব্যনির্মাণে সযত্নে প্রবিষ্ট হয়ে যায়। বহুতর প্রাচীন রান্নার হৃদিশ আমরা পাচ্ছি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলকাব্যে বহুতর মাছের নাম, বাঙালির মৎস্যপ্রিয়তার তথ্য রসনাবিলাসের ইঙ্গিতবাহী। এছাড়াও আছে বিবিধ মিষ্টান্ন ও পিষ্টকাদির বর্ণনা। একদিকে সেই সময়ের রসনা বিলাসের স্বরূপ সন্ধান, অন্যদিকে বর্তমানে সেই সময়ের বিভিন্ন মাছ-তরি-তরকারির অবলুপ্তির দিক অন্বেষণ চেষ্টা। রসনাপ্রিয় বাঙালির মনোজগতের স্বরূপ সন্ধানের প্রয়াস হয়েছে এই সন্দর্ভে।

সূচক শব্দ (Key Words): মধ্যযুগ, বাংলা, সাহিত্য, বাঙালি, রসন

সাধারণ ভাবে ১২০০ থেকে ১৮০০ শতক পর্যন্ত সময়কালকে আমরা বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ বলে পরিচয় দিয়ে থাকি। এই সময়ের অন্যতম জনপ্রিয় সাহিত্যধারা অনুবাদ কাব্য, মঙ্গলকাব্য, চৈতন্যজীবনীকাব্য। আমরা বাংলা সাহিত্যের এই শাখাগুলিতে তৎকালীন বাঙালি-মানসের রসনাবিলাস অনুসন্ধান করার প্রয়াস করব। মাছে-ভাতে বাঙালি শব্দটি যে নিছক প্রবাদ নয়, আবহমান কালের বাঙালির খাদ্য তালিকা সেই প্রমাণ দেয়। খ্রিষ্টীয় চতুর্দশ শতকে প্রাকৃত পৈঙ্গল গ্রন্থের একটি পদে আমরা পাই :

ওগগর ভত্তা রন্তঅ পত্তা।

গায়িক যিত্তা দুধ্ধ সজুত্তা।।

মোইণি মচ্ছা নালিচ গচ্ছা।

দিজ্জই কত্তা খাই পুণ্যবত্তা।^১

অর্থাৎ, কলাপাতায় ঢালা গরম ভাত, জুতসই দুধ, মৌরলা মাছ, পাট (নালিতা) শাক রান্না করে খেতে দিচ্ছেন কান্তা, পুণ্যবান ভোজন করছেন। চর্যাপদে ভাতের উল্লেখ আমরা পাই। হরিণের মাংসের জনপ্রিয়তার কথাও জানতে পারি। নদীমাতৃক বাংলাদেশে মাছও প্রিয় ভোজ্য ছিলো, অনুমান করা যায়। চর্যার আদি কবি লুই পা-র নামের সাথে মৎস্যযোগ্য এই অনুমানকে প্রশ্রয় দেয়।

মধ্যযুগকে আমরা সাধারণভাবে দু'ভাগে ভাগ করি। আদি মধ্যযুগ এবং অন্ত্যমধ্যযুগ। এই দুই যুগের গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যধারা মঙ্গলকাব্য এবং চৈতন্যজীবনীকাব্য। আমরা অনুসন্ধান করবো মঙ্গলকাব্যের বিভিন্ন ধারা, মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল সেখানে বাঙালির রসনাবিলাস কিভাবে ধরা দিয়েছে। মনসামঙ্গল কাব্যের একটি পূর্ববঙ্গ ধারা থাকার দরুণ আমরা

* Assistant Professor, Department of Bengali, Sree Chaitanya Mahavidyalaya

E - Mail Id: ujjwalmp@gmail.com

তৎকালীন পূর্ববঙ্গের রন্ধন সংস্কৃতির পরিচয় সন্ধান করার প্রয়াস করবো। বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল কাব্যে রকমারি মাছের নাম পাই, রুই, মাগুর, খরসুন, চিংড়ি, চিতল, কই ইত্যাদি। শুধু বিভিন্ন প্রকার মাছের নাম উল্লেখই নয়, সেই মাছের রন্ধন-প্রণালীর বর্ণনাও দিয়েছেন কবি: রুই মাছ দিয়ে কলমিশাকের আগা, মরিচের গুঁড়ো দিয়ে চিংড়িমাছের মাথা, কৈ মাছের ঝোল মরিচ যোগে, গিমাশাক দিয়ে মাগুর মাছ ইত্যাদি। মনসামঙ্গলের আরেক কবি নারায়ন দেবের *পদ্মাপুরাণ* গ্রন্থে *বেহুলার বিবাহে তারকার রন্ধন* অংশে সেকালের বিবাহাদি অনুষ্ঠানের রসনাবিলাসের পরিচয় পাই। তারকা যা যা রন্ধন করেছিলো, তার একটি অংশ :

ভাজিয়া তুলিল কথ চিথলের কোল।
মাগুর মৎস দিয়া রাঞ্জে মরিচের ঝোল।।
কৈ মৎস তলিত করিল বিস্তর।
মহাসোল দিয়া পাছে রাঙ্কিল অম্বল।।
মহাতৈল দিয়া ইচার রসলাস।
দেড় জোজোন যায় ব্যঞ্জনের বাস।।
রুহিতের মুণ্ডা দিয়া মাস ডাল করি।
রাঙ্কিল মরিচ তবে তারকা সুন্দরী।।^২

রসনাপ্রিয় বাঙালির মৎস্যপ্রীতি ধরা পড়েছে মধ্যযুগের কবির এই বর্ণনায়।

মুকুন্দ চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যেও অংশ সে যুগের রসনা-বিলাসের নমুনা ব্যাপক ভাবে উঠে আসে। মাছ-মাংস বাদ দিয়েও হেলেঞ্চা, কলমি, গিমা, পুঁই, কচু ইত্যাদি শাকের কথা বাঙালির খাদ্য তালিকায় স্থান পেয়েছে দেখতে পাই। আরও লক্ষ্য করার বিষয়, মুকুন্দের কাব্যে অন্যান্য ভোজ্যের পাশাপাশি বিভিন্ন রকম ডালের প্রাধান্য। মুসুর, মুগ, মাষ ইত্যাদি। মুকুন্দের কাব্যের বাঙালি রসনার হাতছানি এড়িয়ে যেতে পারেননি স্বয়ং দেবাদিদেব, শিব তাঁর ঘরনীকে যে যে পদ রান্না করতে বলেছিলেন, তার মধ্যে ছিলো শুভো, ঘি-তে জিরে ফোড়ন দিয়ে পালং শাক, মিষ্টি স্বাদের ঘন ছোলার ডাল, বথুয়া আর সর্ষে শাক, বড়ি-আদার রস দিয়ে নটেশাক ইত্যাদি। *নিদয়ার সাধ ভক্ষণ* অংশে, নিদয়ার পছন্দের খাদ্য তালিকার একটি খণ্ড চিত্র:

আমার সাধের সীমাহেলেঞ্চা কলমী গিমা
বোদালি কাটিয়া কর পাক।
ঘনকাটি খরজ্বালে সন্তোলিবে কটু তৈলে
দিবে তাতে পলতার শাক।।
পুঁই ডগা মুখী কচু ফুল বড়ি আর কিছু
দিবে তাতে মরিচের ঝাল।^৩

এছাড়াও নিদয়া খেতে চেয়েছে, হাঁসের ডিমের বড়া, চিংড়ির বড়া। নকুল, গোধিকা, সজারু র মাংসও তার রসনাবৃত্তে পাই। তবে নিদয়া ছিলো নিষাদজাতিয়া রমণী। শেষোক্ত মাংসগুলি মধ্যবিত্ত বাঙালির হেঁসেলে সম্ভবত প্রবেশাধিকার পায়নি।

চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ অনুযায়ী চৈতন্যদেবের মা তাঁকে কুড়ি রকমের শাক রান্না করে খাইয়ে ছিলেন। কলমি, নটে, নালি তা, নিম, পলতা, হেলেঞ্চা, পুঁই, বেতাগ, বেনাতি ইত্যাদি। এই ভোজন পর্ব অবশ্য নিরামিষ। এই গ্রন্থেই আমরা আরও বিচিত্র সব বাঙালি রান্নার পরিচয় পাই:

সার্দক বাস্তক-শাক বিবিধ প্রকার।
পটোল কুন্ডাণ্ড বড়ি মানচাকি আর।।
চই মরিচ সুক্ট দিয়ে সব ফলমূলে।
অমতনিন্দক পঞ্চবিধ তিক্ত ঝালে।।
কোমল নিম্পত্র সহ ভাজা বার্তাকী।

পটোল ফুল বড়ি ভাজা কুখাণ্ড মানচাকী।।
 নারিকেল শস্য-ছানা শর্করা মধুর।
 মোচাঘন্ট দুধকুখাণ্ড সকল প্রচুর।।
 মধুরাল্ল বড়াল্লাদি অল্প পাঁচ ছয়।
 সকল ব্যঞ্জন কৈল লোকে যত হয়।।^৪

সুপণ্ডিত কৃষ্ণদাস কবিরাজ কৌশলে চৈতন্যলীলার অভ্যন্তরে সমকালীন বাঙালির রসনাস্রোতকে প্রবাহিত করেছেন।

কৃতিবাসের শ্রীরাম পাঁচালি -তে রামচন্দ্রের বনবাস থেকে ফেরার পর ভোজসভার বর্ণনাতেও বাঙালির রসনা বৈচিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। উত্তরাকাণ্ডে বনবাস থেকে ফেরার পর চৌদ্দ বছর উপবাসে থাকা লক্ষ্মণকে সীতা স্বহস্তে রান্না করে খাইয়েছিলেন কৃতিবাসের কাব্যে। সেই তালিকায় যে যে খাদ্যবস্তুর উল্লেখ আমরা পাই, সেখানেও বাঙালিয়ানার পরিচয় স্পষ্ট। সেই খাদ্য তালিকার একটি অংশ:

প্রথমেতে শাক দিয়া ভোজন আরম্ভ।
 তাহার পরে সুপ আদি দিলেন সানন্দ।।
 ভাজা ঝোল আদি করি পঞ্চাশ ব্যঞ্জন।
 ক্রমে ক্রমে সবাকারে কৈল বিতরন।।
 শেষে অম্বলান্ত হলে ব্যঞ্জনে সমাপ্ত।
 দধি পরে পরমাল্ল পিষ্টিকাদি যত।।^৫

এছাড়াও ঘৃত, দধি, দুধ, মধু, ক্ষীরের নাড়ু, কলা, কাঁঠাল ইত্যাদির ও উল্লেখ আমরা পাই।

ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যেও বাঙালির রুচি অনুযায়ী রসনার পরিচয় মেলে। ভারতচন্দ্র ছিলেন রাজসভার কবি। রাজসভার গরিমা যেমন তাঁর কাব্যের ছত্রে ছত্রে মেলে, তেমনি মেলে রাজভোজের চিত্রও। কত রকম মাছের উল্লেখ আছে তাঁর কাব্যে, সেদিকে একবার দৃষ্টিপাত করা যাক:

চিতল ভেকুট কই কাতল মুগাল।
 বানি লাটা গড়ুই উলকা শৌল শাল।।
 পাঁকাল খয়রা চেলা তেচক্ষা এলেঙ্গা।
 গুতিয়া ভাঙ্গন রাগি ভোলা ভোলচেঙ্গা।।
 মাগুর গাগর আড়ি বাচা বাটা কই।
 কালবসু বাঁশপাতা শঙ্কর ফলই।।
 শিজি ময়া পাবদা বোয়ালি ডানিকোনা।
 চিঙ্গড়ি টেঙ্গরা পুঁটি চান্দাগুঁড়া সোনা।।
 গাঙ্গদাঁড়া ভেদা চেঙ্গ কুড়িশা খলিশা।
 খরশুয়া তপশিয়া পাঁজাস ইলিশ।।^৬

মধ্যযুগের বাঙালির খাদ্য তালিকায় অন্যান্য যে সব তরি তরকারি ছিলো, তার মধ্যে অন্যতম ওল, কচু, করঞ্জা, কাঁচকলা, কুমড়ো, পটল, বরবটি, বেগুন, মুলো, শিম, লাউ। নারিকেলের উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে, এখনকার বাঙালির রান্নাঘর অচল যে বস্তুর ছাড়া, সেই আলুর দেখা মেলেনা মধ্য যুগের সিংহভাগ জুড়ে। আলু আরো অনেক আসবে, পর্তুগীজদের হাত ধরে। সপ্তদশ

শতকের প্রায় মধ্যভাগে। জনপ্রিয় হতে সময় লাগবে। শুধু রান্নার বর্ণনাই নয়, খাদ্য-গ্রহণ বিষয়ক বিধি-নিষেধের বিভিন্ন উল্লেখও পাই মধ্যযুগের কাব্যে। মুকুন্দের চক্রবর্তীরা কাব্যে আমরা দেখি-মাঘ মাসে কাননে তুলিতে নাই শাক।

মুকুন্দ চক্রবর্তীর কাব্যে সেকালের মাছ রান্নার নানান বৈচিত্র্য আমরা দেখতে পাই। কাতলা মাছের সুস্বাদু ঝোল, সর্ষের তেল দিয়ে চিতল মাছের পেটি ভাজা। বড়ি-আলু-কুমড়া দিয়ে রুই মাছের ঝোল, আদার রস দিয়ে সর্ষের তেলে কই মাছ, কাঁচা আম দিয়ে শোল মাছ, খরশোল মাছ ভাজা ইত্যাদি। খাদ্য নিয়ে বিভিন্ন বিধিনিষেধ থাকার জন্য, বিশেষত হিন্দু বাঙালি বিশ্ববাদের নিরামিষ ভোজনের জন্য নিরামিষ বহুবিধ সুস্বাদু পদের কথা এসেছে। ভাজা, পোড়া, বড়া, সুজ্ঞ, ডাল, ঝোল, ব্যঞ্জন, অম্বল বিভিন্ন রীতি ও পদ্ধতি মেনে রান্নার উল্লেখ করেছেন মধ্যযুগের কবিগণ। শুধু তাই নয়, খাবার পরিবেশন করার রীতিও লক্ষণীয়। বাঙালি রীতি মেনে প্রথমে শাক থেকে ধীরে ধীরে অন্যান্য পদের আগমন ঘটে।

রসনা বিলাসের শেষে অবশ্যই উল্লেখ করতে হয় মিষ্টান্নের কথা। মধ্য যুগের বাংলা কাব্যে বহুবিধ মিষ্টান্নের উল্লেখ পাওয়া যায়। ক্ষীরখণ্ড, ক্ষীরপুলি, চন্দ্রপুলি, আমেরখণ্ড, মোহনভোগ, দধি, কাজিবিড়া, ছানা, অমৃতগুটিকা ইত্যাদির দেখা পাই। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মনোহারার উল্লেখ পাওয়া যায়। আছে বিভিন্ন প্রকার নাড়ুর উল্লেখ। নারকেল, চিড়ে, মুড়ি, মুড়কি খই ইত্যাদি দিয়ে তা প্রস্তুত করা হত। সন্দেশের মত বহুল প্রচলিত মিষ্টান্নদ্রব্যের দেখাও মেলে। বিভিন্ন প্রকার পিষ্টকের উল্লেখও আমরা পাই।

এতক্ষণ যে খাদ্যতালিকা আমরা দেখলাম, তা বড়লোকের রসনাবিলাস। অথবা ভোজের খাওয়া। মধ্যযুগের নিম্নবিত্তের ক্ষুদ্রবৃত্তির পরিচয় কি নেই কাব্যে? আছে। প্রদীপের নীচে অন্ধকারের মতো। মুকুন্দ চক্রবর্তী দরিদ্র ব্যাধ কালকেতুর খাদ্য তালিকায় রেখেছেন খুদজাউ। ফুল্লরা নিজের বারোমাসের দুঃখ বর্ণনা করতে গিয়ে দেবী চণ্ডীকে আমানি খাবার গর্ত দেখায়। খুদের উল্লেখ মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে নানা ভাবে আসবে। আর, যুগসন্ধির ক্রান্তিকালের কবি ভারতচন্দ্র তো লিখেই ফেললেন-
অন্ন বিনা অন্নদার অস্তিত্বসার। তখনো ঈশ্বরী পাটনীরা সন্তানের জন্য মোক্ষ-অর্থ নয়, দুঃখভাতটুকুই চেয়ে নেয়।

আমাদের অনুসন্ধান মধ্যযুগের বাঙালির রসনা-বিলাসের পরিচয় আমরা তুলে ধরলাম। অনেক পদ এখনো বাঙালির রান্নাঘরে তার সুনাম অক্ষয় করে চলেছে, আর যুগের সাথে, কালের নিয়মে হারিয়েও গিয়েছে বহু। তবে বাঙালি তার রসনাবিলাস থেকে যে সরে আসেনি, তার পরিচয়, বর্তমান সমাজ-জীবনে যেমন আমরা পাই, তেমনই, আধুনিক যুগের সাহিত্যেও পড়েছে তার ছাপ।

তথ্যসূত্র :

- ১। গোপালহালদার, *বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা*, প্রথমপর্ব, প্রথম সংস্করণ, এমুখার্জী এন্ড কোং লিমিটেড, কলকাতা, ১৩৬১। পৃ-১৭।
- ২। শ্রীতমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্ত (সম্পা), *সুকবি নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণ*, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ১৯৪৭। পৃ-৪৮।
- ৩। মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, *কবিকঙ্কণ চণ্ডী*, ইন্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড, কলকাতা, ১৯২১। পৃ-৪৮।
- ৪। শ্রীসুকুমার সেন (সম্পা), *কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত চৈতন্যচরিতামৃত*, সাহিত্য অকাদেমী, নিউ দিল্লী, ১৯৩৬। পৃ-১২৪।
- ৫। ডঃ দেবেশকুমার আচার্য, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, আদি ও মধ্যযুগ, ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, কলকাতা, ২০১৭। পৃ- ২১৭।
- ৬। শ্রীভারতচন্দ্র রায়, *অন্নদামঙ্গল*, সংস্কৃত যন্ত্রে দ্বিতীয়বার মুদ্রিত, কলিকাতা, ১৩৭৫ শক। পৃ-৮৯।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী:

- ১। অনিরুদ্ধ রায় ও রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায়, *মধ্যযুগের বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি*, কে পি বাগচি, কলকাতা, ১৯৯২।
- ২। আবুল মোমেন, *বাংলা ও বাঙালির কথা*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০০।
- ৩। গোলাম মুরশিদ, *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি*, তৃতীয় মুদ্রন, অবসর, ঢাকা, ২০১৫।
- ৪। নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস*, কলকাতা, দে'জ, ২০০১।
- ৫। বিনয় ঘোষ, *পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি*, চতুর্থ খণ্ড, প্রকাশ ভবন কলকাতা, ১৯৯১।